আশুতোষ-রামানন্দ দ্বৈরথ : *পটভূমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

অর্ণব নাগ

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং *মডার্ন রিভিউ* ও *প্রবাসী* পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কের অবনতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অবিসংবাদিত ভূমিকা ছিল। যদিও এর মাপকাঠিতে এঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের তল পাওয়া মুশকিল। ১৮৮৩ সালের গোড়ায় রামানন্দ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে ভর্তি হলেন, তখন আশুতোষ বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। আশুতোষের কনিষ্ঠ ও যৌবনেই প্রয়াত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সেইসূত্রে আশুতোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল রামানন্দের। তাঁর স্মৃতিচারণায় :

> আমরা যখন নীচের ক্লাসে পড়ি, আশু-বাবু তখন একজন বিখ্যাত ছাত্র এবং কলেজের বিতর্ক-সভার অন্যতম বাগ্মী নেতা। তখনই, তাঁহার এই খ্যাতি রটিয়াছিল, যে, গণিতের কোন কোন অধ্যাপক অপেক্ষা গণিতে তাঁহার মাথা খেলে বেশী। তিনি ধনী লোকের ছেলে ছিলেন, কিন্তু কখনও বিলাসী বা ফ্যাশনেব্‌ল ছোকরাদের মধ্যে পরিগণিত হন নাই। আমাদের এখন যতটা মনে পড়ে, তাহাতে তাঁহার একখানা সাদাসিধে ধুতি-পরা ও একটা লংক্লথের পিরান বা পাঞ্জাবী গায়ে, মেধা দৃঢ়চিত্ততা আত্মবিশ্বাস ও সাহস ব্যঞ্জক চেহারাই মনে আসে। লম্বা কোঁচা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে পড়ে না, চাদর ব্যবহার তিনি বড় একটা করিতেন বলিয়াও মনে পড়িতেছে না। এবং এইরূপই মনে হইতেছে, যে, সেই কারণে তাঁহাকে ছাত্রেরা পরিহাস করিয়া চাদরনিবারিণী সভার সভাপতি বলিত।[১]

আর এই চেনা-জানার সূত্রেই তাঁর সম্পাদিত *প্রদীপ* পত্রিকায় আশুতোষের প্রথম সচিত্র জীবনীটি লিখে ফেলেন রামানন্দ—'ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' (চৈত্র, ১৮৯৮ খ্রি.)। এই জীবনীর প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। কারণ এটি রচনার জন্য আশুতোষের নিজের হাতে লেখা বেশ কিছু তথ্য রামানন্দকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল, এবং এই জীবনী প্রকাশের পর বহু বছর অবধি আশুতোষের কাছে তাঁর জীবন-সম্বন্ধে কারোর কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে তিনি রামানন্দ-রচিত ওই জীবনীটির উল্লেখ করতেন। ইতিপূর্বে ১৮৮৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন আশুতোষ। ১৮৮৯ সালের ১৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন তিনি। এই বছরেরই মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভ্য হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তার খতিয়ানও তিনি রামানন্দকে অবশ্যই দিয়েছিলেন।

রামানন্দ-রচিত আশুতোষ-জীবনীটি খুব একটা সহজলভ্য নয় বলেই, বা আরও ভালোভাবে বললে এর উপাদানগুলির ব্যবহার সেভাবে না হওয়ায় মাত্র চৌত্রিশ বছরের এক যুবক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিলেন, তা অনেকাংশে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আশুবাবুর যে গোটা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতনের বদলে স্বাধীনতাজান বাষ্প প্রয়োগের কার্টুন চিত্র
(প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯)

দশেক বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সফল রূপায়িত নীতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা মোটামুটি এরকম—প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি যাতে বিষয়বস্তুর ওপর পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করে নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে হবে। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার গুণমান প্রতি বছর যাতে একই অর্থাৎ সমান থাকে সেই চেষ্টা করা। তৃতীয়ত, পরীক্ষার সততা রক্ষা করা। অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ে অধ্যাপনা করেন সেই বিষয়ে তিনি প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন না। চতুর্থত, ইতিপূর্বে যে নিয়ম ছিল তাতে মূলত ইংরেজরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারতেন। আশুতোষের প্রচেষ্টায় সেই নিয়মের বদল হয়ে উপযুক্ত ডিগ্রিধারীরাই পরীক্ষক হতে থাকেন। পঞ্চমত, স্বাধীন গবেষণায় উৎসাহ প্রদান। আশুতোষের প্রস্তাবেই এটা স্থির হয় যে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ কেবলমাত্র স্বাধীন গবেষকদের (অর্থাৎ আকর উপাদানের সাহায্যে গবেষণা করা)-ই পাওনা হবে। ষষ্ঠত, স্বতন্ত্র ইংরেজি রচনায় উৎসাহদানের কৃতিত্ব আশুবাবুরই। তাঁরই প্রস্তাবে এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা ঠাঁই পেয়েছে। সপ্তমত, কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করা এবং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার কৃতিত্বও তাঁরই পাওনা। অষ্টমত, তা বলে এই শৃঙ্খলা যাতে শৃঙ্খলে পরিণত না হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি ছিল আশুতোষের। তাই প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও নিয়ম স্থানবিশেষে কঠোর বোধ হলে তা শিথিল করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। নবমত, দেশের প্রচলিত ভাষাগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে উৎসাহদানেও প্রয়াসী ছিলেন তিনি। এবং দশমত, সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে নতুন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপনেও তাঁর সোচ্চার ভূমিকা ছিল।[২]

মনে রাখা প্রয়োজন যে সম্পাদক হিসেবে স্বনামধন্য রামানন্দ সব্যসাচীর মতই সংবাদপত্র পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম জীবনে অধ্যাপনাও করেছেন। আশুতোষের জীবনী রচনাকালে তিনি এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষও। সুতরাং শিক্ষা-জগতে তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে তাঁকে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এই কারণেই আশুতোষের এ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির বড়ো সমর্থক ছিলেন তিনি। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাই আমূল বদলে গেল পরবর্তীকালে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ টানা আট বছর চারবারের টার্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে মনোনীত হন আশুতোষ। পরে ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পঞ্চমবারের জন্যও উপাচার্য হয়েছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সুমহৎ কীর্তি ১৯১৭ সালে পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার প্রবর্তন। আর জীবনের এই পর্বেই *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন তাঁর কঠোরতম সমালোচক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন এই অভিযোগে বারংবার সরব হয়েছেন রামানন্দ। এই একনায়কতন্ত্রের অবসানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রস্তাবও *মডার্ন রিভিউ*য়ের পাতায় আলোচনা করেন তিনি। রামানন্দ লেখেন :

> One-man rule is apt to produce various evils, which need not be described. These exist in the Calcutta University. To destroy these evils, it is necessary to destroy one man rule. This can be done only by making all or a majority (say, at least four-fifths) of the Fellowships in the Senate and the memberships of the other bodies elective, and by making the electorates quite broad-based. It may be tentatively suggested that all graduates of the University of five years' standing, whether registered or not, should form one electorate. All professors, lecturers, tutors and demonstrators in affiliated colleges should form another electorate. A third electorate should consist of all teachers in high schools recognised by the University. The schools swell the revenues of the University; they should therefore be represented therein on the principle of no contribution without representation. If considered necessary, steps may be taken to prevent overlapping. We are informed that the Patna University electorates are more democratic and wider than here, and are hence productive of good results.[৩]

কিন্তু রামানন্দের এই লেখনীকে আশুতোষের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত, এমনটা ভাবলে সত্যের অপলাপ হবে। কারণ তারপরেই রামানন্দের ঘোষণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের প্রভাব খর্বের চেষ্টা অসাধ্য ও অনুচিতও। কারণ তাঁর 'মেধার শক্তি', 'বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জ্ঞান' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিষ্ঠা'র ফলেই আশুবাবুর এই প্রভাব গড়ে উঠেছে। যার প্রতি চিরকালই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন রামানন্দ। তিনি শুধু চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যেরও সমান নৈতিক ও স্বাধীন সুযোগ থাকুক। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের স্বজন-পোষণের বিরুদ্ধে রামানন্দ-কণ্ঠ বরাবরই সচকিত :

> আশু-বাবু অনেক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মী রূপে পরিশ্রম করিতেছেন, এবং তাহার জন্য তিনি কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন নাই। ইহা

> প্রশংসার কথা। যদি তাঁহার সম্পর্কীয় লোকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিয়া লাভবান না হইতেন, তাহা হইলে আরও প্রশংসার বিষয় হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যতদূর শুনিয়াছি, পরীক্ষকতার কাজ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোল-সতেরটি কাজে আশু-বাবুর সম্পর্কীয় লোকেরা নিযুক্ত আছেন। সমুদয় কর্ম্মচারীর প্রকৃত পরিচয় পাইলে সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক বা কম হইতে পারে।[৪]

দ্য মডার্ন রিভিউ-য়ের সম্পাদকীয় স্তম্ভ 'নোটস'-এ ১৯২১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় 'পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচিং ইন দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ১৯১৯-২০' শীর্ষক একটি লেখায় আশুতোষের একপ্রকার তুলোধোনা করেন রামানন্দ। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রখর বিচার-শক্তির অবমাননা করছেন এই ছিল রামানন্দের অভিযোগ। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পূর্ণ সময়ের লেকচারারের বেতন যেখানে মাত্র দু'শো টাকা, সেখানে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক দেবদত্ত আর. ভাণ্ডারকরের বেতনই হলো বারোশো পঞ্চাশ টাকা। এছাড়াও সংস্কৃত, পালি, মারাঠি ভাষা শিক্ষাদানের জন্যও তাঁর প্রাপ্তিযোগ ঘটে যথাক্রমে একশো, পঞ্চাশ ও পঞ্চাশ টাকা। সবমিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে চৌদ্দশো পঞ্চাশ টাকা। এক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ড. আবদুল্লা আল মামুন আল সোহরাওয়ার্দির কথা। যিনি আরবি, ইতিহাস ও উর্দু অধ্যাপনার জন্য পান যথাক্রমে দু'শো, তিনশো ও পঞ্চাশ টাকা। সবমিলিয়ে হল পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা। রামানন্দের অভিযোগ ছিল একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণির অধ্যাপক এহেন প্রভূত অনায্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, অন্যদিকে তখন বঞ্চনার শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছেন আরেক দল শিক্ষক।[৫]

দ্য মডার্ন রিভিউ-য়ের ওই প্রবন্ধে, এব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ দুই অধ্যাপক এ কে চন্দ এবং পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রীর নামোল্লেখ করে, তাঁরা সরকারি চাকুরি গ্রহণ করায় আশুতোষ তাঁদের 'পলাতক' আখ্যা দিয়ে যে বক্রোক্তি করেছিলেন, তার তীব্র সমালোচনা করেন রামানন্দ। বিষয়টি নিয়ে একইভাবে তাঁকে নিন্দায় মুখর হতে দেখা গিয়েছিল *প্রবাসী*-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এও ('স্বাধীনতা ও স্বার্থত্যাগ', অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ব.)। সেবারে অবশ্য কোনও অধ্যাপকের নাম রামানন্দ নেননি। প্রসঙ্গত, তখন তাঁর সম্পাদিত *প্রবাসী* ও *দ্য মডার্ন রিভিউ*য়ের সম্পাদকীয় স্তম্ভ যথাক্রমে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'নোটস'-এ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। অন্যত্রও এই নিয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের এক অধিবেশনে বিষয়টি সামলাতে তিন দফা দাওয়াই পেশ করলেন। যাতে সংবাদমাধ্যমের মুখে লাগাম পরানো যায়। বলে রাখা দরকার যে রামানন্দের অন্যতম সহযোগী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার কিছুদিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আটর্স শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল চারুবাবুই হয়তো তাদের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি রামানন্দের নজরে আনছেন। তাই চারুচন্দ্রের বকলমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও অধ্যাপকদেরও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে একটা গণ্ডি টানার চেষ্টা হচ্ছিল।

রামানন্দ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপননীতি' শিরোনামে *প্রবাসী*-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে ('বিবিধ প্রসঙ্গ', কার্তিক, ১৩২৭ ব.) এ বিষয়ে তুমুল সমালোচনা করেন। আমাদের আলোচ্য তাঁর 'স্বাধীনতা ও স্বার্থত্যাগ' শিরোনামাঙ্কিত *প্রবাসী*-র সম্পাদকীয়তে রীতিমত কটাক্ষ করে তিনি বলেন রাজেন্দ্রনাথের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটুকু স্বাধীনতা অবশিষ্ট রয়েছে, সেটুকুও লুপ্ত হবে। এবং তাঁর সন্দেহ যে এই প্রস্তাব আপাতত সূচ, পরে তা ফালে পরিণত হবে।[৬] আসলে রামানন্দবাবুর ইঙ্গিত ছিল আশুতোষের একনায়কতন্ত্রের দিকে, যে কারণে বঞ্চিত হয়ে একদল অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সরকারি চাকুরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আশুতোষের 'ডিকটেটরশিপ' কুম্ভীলকবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিচ্ছে এমন অভিযোগ করতেও রামানন্দ দ্বিধা করেননি :

> It has promoted plagiarism and plagiarists also, and has placed some 'spectres of humanity' in positions of responsibility who have not been able to distinguish between originality and its opposite.[৭]

এই 'spectres of humanity' শব্দবন্ধের মধ্যে আশুতোষ-কে চরম খোঁচা ছিল। আশুতোষ নিজেই তাঁর সমালোচকদের 'fleeting spectres of humanity' অর্থাৎ 'মানব-দেহধারী ক্ষণস্থায়ী বায়বীয় অবস্থা' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। এবার তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো রামানন্দের কণ্ঠে (দ্র. 'মানবদেহধারী ভূত', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ ব.)। তিনি লিখলেন;

> যিনি নিজের সমালোচকদিগকে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত উপ বা অপদেবতা মনে করেন, তিনি অবশ্যই অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে চিরকালের জন্য বিরাজমান অমর দেবতা মনে করেন। কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে তাঁহার কোন অমর কীর্ত্তি আছে কিনা? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিলেই অমর হওয়া যায় না।[৮]

তাঁর সমালোচনায় ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে, সেটুকু মেনে নিতে রামানন্দের আপত্তি ছিল না : 'মধ্যে মধ্যে ভুল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পুনঃপুনঃ এই সমালোচনার কাজে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়টির সংস্কার আবশ্যক, এবং তাহার নিমিত্ত উহার দোষ ত্রুটি দেখান আবশ্যক।'[৯] কিন্তু তাঁর মনে নিদারুণ ক্ষোভ ছিল আশুতোষ কেন নিজের ত্রুটি স্বীকার করেন না? আশুতোষের সব কর্ম নির্ভুল, এমনটা তো তাঁর অতি বড়ো সমর্থকও বলতে পারবেন না। ১৯২১ সালে পঞ্চমবারের জন্য আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পর ঘোষণা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও 'বিবেকবর্জিত সমালোচনা' (আনস্ক্রুপিউলাস ক্রিটিকস)-র বিতর্কে জড়াবে না। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে রামানন্দ লিখলেন :

> Sir Asutosh has, however, never admitted that there has ever been in the press any correct, justifiable and honest criticism. What can be the reason? It is due to obtuseness or the lack of intellectual honesty? Or may it be that Sir Asutosh is so conceited as to think that the ordinary code of ethics must be as plastic in his hands as wax or clay?[১০]

প্রবাসী-র দু'টি সংখ্যায় (মাঘ এবং চৈত্র, ১৩২৭ ব.) 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা' শিরোনামে বিভিন্ন সময়ে *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ*-তে প্রকাশিত তাঁর কৃত এ-সংক্রান্ত কিছু সমালোচনার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর দেন রামানন্দ। তারই মধ্যে করেন একটি মারাত্মক অভিযোগ। বিদায়ী উপাচার্য ডা. নীলরতন সরকারকে 'সাক্ষীগোপাল' রেখে একপ্রকার 'বলির পাঁঠা' করছেন এবং তাঁরই বকলমে আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করছেন—এমনই ছিল রামানন্দের অভিযোগ। তিনি লিখেছিলেন :

> শুনা যাইতেছে স্যার্ নীলরতন সরকারের কার্য্যকাল শেষ হইলে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস্ চ্যান্সেলার্ হইবেন। যিনি কার্য্যতঃ কর্ত্তা, নামেও তাঁহারই কর্ত্তা হওয়া উচিত। সুখ্যাতি অখ্যাতি তাঁহারই পাওনা হওয়া উচিত। একজন সাক্ষীগোপাল রাখিয়া কাজ চালান অকর্ত্তব্য। ঐ সাক্ষীগোপালকে যদি আবার অন্যের কৃত কাজের অখ্যাতির ভাজন অর্থাৎ স্কেপ্‌গোট্ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহা আরও অন্যায় হয়। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন যেরূপ গঠন, অর্থাৎ যে সব ফেলো, সীণ্ডিক্, শিক্ষক প্রভৃতিকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাতে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরই ভাইস্-চ্যান্সেলার হওয়া উচিত।[১১]

রামানন্দবাবুর এই খেদ যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর অভিমানবশত, তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। কারণ *দ্য মডার্ন রিভিউ*-তে 'দ্য নেক্সট ভাইস্-চ্যান্সেলর অব দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় সংবাদ পরিবেশন করেন তিনি (দ্র. 'নোটস', *দ্য মডার্ন রিভিউ*, এপ্রিল, ১৯২১ খ্রি.)। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে লর্ড রোনাল্ডশে-র সভাপতির অভিভাষণে আশুতোষের প্রতি তাঁর প্রশংসা বাণী তুলে ধরা হয়েছিল। যে প্রশংসার সমর্থক ছিলেন স্বয়ং রামানন্দবাবুও। কিন্তু একই সঙ্গে উক্ত প্রতিবেদনে এর 'অন্ধকার দিক'টিও তুলে ধরতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। যে অসামান্য নিরপেক্ষতা ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সংবাদপত্র পরিচালনা নীতির মূলমন্ত্র, আশুতোষের সমালোচনাও তার স্বাদু অংশ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাই এর গ্রহণযোগ্যতা অনেকক্ষেত্রেই সংশয়ের গণ্ডির বাইরেই রয়ে গিয়েছে।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় *প্রবাসী*-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতির নিয়োগ' শীর্ষক রচনায় এই নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে রামানন্দের আঙুল আশুতোষের দিকেই। তাঁর মূল বক্তব্য :

> নূতন অধ্যাপকের আবশ্যকতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের সঙ্গতি বিবেচিত হয় না; বিজ্ঞাপনও ক্বচিৎ দেওয়া হয়। এবং বিজ্ঞাপন দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহাকে চাকরী দিতে চান তাহারই চাকরী হয়। বিজ্ঞাপন যে-সব ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না, তাহার ত কথাই নাই। নিয়োগকর্ত্তা-কমিটির অধিবেশনের বহু কাল পূর্ব্বে আশুবাবু যাহাদিগকে মৌখিক-নিয়োগ-অঙ্গীকার দিয়া রাখেন, তাহাদেরই চাকরী হয়।[১২]

রামানন্দের তীর আশুতোষের জামাতা অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি-তে এম.বি. পাশ। তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়েছিল। রামানন্দবাবুর কটাক্ষ : 'ডাক্তারীতে এম্-বি পাস্ করিবা মাত্র নৃতত্ত্বের এম্-এ ক্লাস পড়াইবার মত যোগ্যতা জন্মে, এ কথা ত কখনও শুনি নাই।'[১৩]

এর পরবর্তী বক্তব্যে তাঁর আসল লক্ষ্য পরিষ্কার করলেন রামানন্দ : 'তিনি (অনাথবাবু) যে ঠিক্ শ্বশুর (পড়ুন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার নৃতত্ত্বে পারদর্শিতা প্রমাণিত হইতেছে!'[১৪] এই অপবাদের জবাব দিতে রামানন্দকে একটি দীর্ঘ পত্র পাঠালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন। এর প্রত্যুত্তর সহ রামানন্দ *প্রবাসী*-র ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় পূর্বোক্ত শিরোনামেই একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশ করলেন। যাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে আশুতোষের জামাতা হওয়া 'অপরাধ' নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটি তাঁর 'অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশন' হতে পারে না কোনওমতেই। অন্যদের থেকে তিনি যোগ্যতম হলে তাঁর কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকতে পারে না।[১৫]

রামানন্দ এও বিশ্বাস করতেন : 'আশু-বাবু তাঁহার পুত্র বা জামাতার যোগ্যতার জন্য 'দায়ী' নহেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত বলিয়া, পুত্র ও জামাতার তথায় নিয়োগ যদি একান্ত অনিবার্য্যই হয়, তাহা হইলে লোকহিতার্থ উহার প্রণালী সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়া এবং নিযুক্তদের বিশেষ যোগ্যতা সন্তোষজনক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কারণ, আশু-বাবুর মত বড় কর্ম্মীর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিলে দেশের অঙ্গমল।'[১৬] যদিও এক্ষেত্রে উপরোক্ত 'প্রণালী' যে মোটেও নিখুঁত ছিল না, বরং তাতে বিস্তর গলদ ছিল রামানন্দ সে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। কারণ স্রেফ মাসিক তিনশো টাকা বেতনে নৃতত্ত্বের অধ্যাপনাতেই অনাথবাবুর বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল না। এর পাশাপাশি ডা. নীলরতন সরকার ও উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে গঠিত দুই সদস্যের কমিটির সুপারিশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসেবে অনাথনাথের নিযুক্তি হয়েছিল। এই পদের মাসিক বেতন তো দু'শো টাকা ছিলই, তাছাড়া মোটর-গাড়ি রক্ষনাবেক্ষণের জন্যও মিলতো মাসিক একশো পঁচিশ টাকা এবং বলাই বাহুল্য চারজনের বসার জায়গা সম্বলিত একটি ফোর্ড মোটর গাড়িও ব্যবহারের জন্য পাওনা ছিল তাঁর। এক ব্যক্তির জন্য দু'টি চাকরির ব্যবস্থা কেন, সঙ্গতভাবেই রামানন্দ সে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। উপরন্তু মোটর-গাড়ির এই সুবিধেটুকুও আশুতোষের জামাতা অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ছিল বাড়তি পাওনা। তাঁর সমমর্যাদার সহকর্মীরা এই সুযোগ থেকে তাহলে বঞ্চিত হলেন কেন, *প্রবাসী*-সম্পাদক স্বভাবতই সে প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।[১৭]

রামানন্দের বাক্যবাণে জর্জরিত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সেই সদস্য অভিযোগ করেন, তাঁর কথায় এই ইঙ্গিত ধরা পড়েছে যে নীলরতনবাবু নাকি আশুতোষের 'হস্তের ক্রীড়নক' মাত্র। ডা. সরকার সম্পর্কে রামানন্দের এহেন মনোভাবের প্রতিফলন আমরা আগেই দেখেছি। যদিও এক্ষেত্রে রামানন্দ মেনে নেন : 'এরূপ ইঙ্গিত করাও আমার অভিপ্রেত ছিল না; যদিও ইহা স্বীকার করি, যে, অনেক সময় লেখকের অনভিপ্রেত ইঙ্গিতও তাঁহার লেখা হইতে বাহির করা যায়।'[১৮] অনাথবাবুর 'ডাক্তার' উপাধি (তৎকালীন সময়ের নিরিখে) নিয়েও আপত্তি ছিল তাঁর।[১৯] বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের স্বজনপোষণ চিরকালই রামানন্দের প্রবল বিরক্তি উৎপাদন করেছে। *দ্য মডার্ন রিভিউ*য়ের সম্পাদকীয় স্তম্ভে (দ্র. 'নোটস', সেপ্টেম্বর, ১৯২১ খ্রি.) 'ইউনিভার্সিটি এগজামিনারস অ্যান্ড এগজামিনিজ রিলেটেড টু দেম' প্রতিবেদনে রামানন্দ দেখান ১৯১৯ সালের ১৩ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেটের একটি

মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ ও ড. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। সেই বৈঠকে যে দু'জনকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তাদের একজন আশুতোষের অন্যতম জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন সতীশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র।[২০] সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ 'নবশিক্ষার বাধাবিঘ্ন' শিরোনামে *মানসী ও মর্মবাণী* সাময়িকপত্রে লেখা এক প্রবন্ধে (দ্র. ফাল্গুন, ১৩২৭ ব.) বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের স্বজন-পোষণের এক আজব সাফাই দেন : 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আশুতোষের নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আত্মীয় অন্তরঙ্গ ঢুকান প্রয়োজন। যদি একবার এই কথা স্বীকার করা যায়, তবে তাঁহার অনেক কাজ ততটা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।'[২১] সুতরাং রামানন্দের এ-সংক্রান্ত অভিযোগগুলি যে নেহাত ভিত্তিহীন ছিল না, তা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি নতুন একটি বিরোধের ক্ষেত্রও আশুতোষের সাধের ও বহু যত্নের ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কাউন্সিলকে ঘিরে প্রস্তুত হচ্ছিল। সেটি হচ্ছে গবেষণার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণার পরিবর্তে, 'মেকি' গবেষণাই প্রাধান্য পাচ্ছে, রামানন্দ এই অভিযোগ বহুবার বহু জায়গায় করেছেন। 'মেকি' অর্থে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—'যাহা গবেষণা নহে, অস্বীকৃত ঋণ, অস্বীকৃত সংকলন বা সাহিত্যিক চুরি।'[২২] *দ্য মডার্ন রিভিউ*-তে 'টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাকটিভিটিস ইন দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' (নভেম্বর, ১৯২০) শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় রচনায় এহেন 'মেকি' গবেষণার বেশ কিছু নমুনা তুলে ধরেছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-পন্থী অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দও *মানসী ও মর্মবাণী*-তে তাঁর পূর্বোক্ত রচনায় আশুতোষের স্বজন-পোষণের মত এই 'মেকি' গবেষণার অভিযোগটিকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

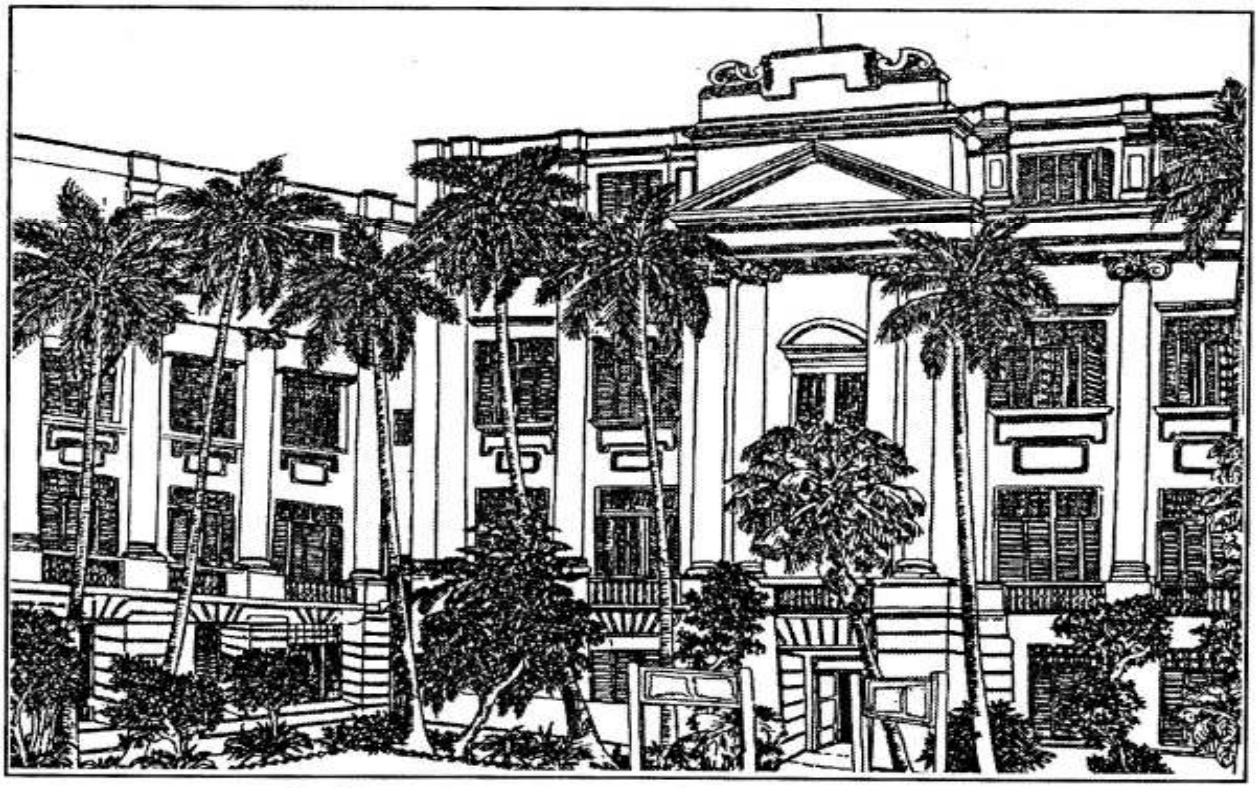

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবন *স্কেচ : রথীন মিত্র*

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেনেটের অভিনন্দনের উত্তরে আশুতোষ তাঁর বক্তৃতায় নিজেকে 'ভারতে গবেষণার প্রবর্তক' হিসেবে দাবি করলে তা নস্যাৎ করতে কলম ধরতে হয়েছিল রামানন্দকে ('ভারতে গবেষণার আরম্ভ', 'বিবিধপ্রসঙ্গ', *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩২৭)। অবশ্য এই বিষয়ে পদ্মনাথ দেবশর্মাও আশুতোষের তুলোধানা করেছিলেন ('সিনেট সভায় স্যর আশুতোষের সভাজন আলোচনা', *নব্যভারত*, আষাঢ়, ১৩২৭ ব.)। স্নাতকোত্তর বিভাগের কার্যবিবরণীতে ধরা পড়েছিল আশুতোষের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস বিষয়ে তাঁর লেকচারের টাইপ করা 'নোট' দিয়েছেন। ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল রামানন্দের কণ্ঠে : 'গোলদিঘির বিশ্ববিদ্যালয় যে চমৎকার মৌলিক গবেষণা-প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন, ইহা তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।'[২৩]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা রামানন্দকে উদ্বিগ্ন করেছিল। এ বিষয়ে বহু লেখনী ধারণ করেছেন তিনি, বাংলা ও ইংরেজিতে যুগপৎ। যেমন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা' (*প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭), 'শিক্ষার উপর ট্যাক্স' (*প্রবাসী*, পৌষ, ১৩২৭), 'ভাইস-চ্যান্সেলারের মন্তব্য' (*প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩২৮), 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় ও কার্য্যপ্রণালী' (*প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩২৮); 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফাইনান্স' (*দ্য মডার্ন রিভিউ*, আগস্ট, ১৯২১ এবং সেপ্টেম্বর, ১৯২১), 'প্রেজেন্ট কন্ডিশন অব্ দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' (এপ্রিল, ১৯২২), 'ফাইনান্স অব্ কেমব্রিজ অ্যান্ড ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' (জুলাই, ১৯২২) ইত্যাদি। এই আর্থিক দুর্দশার 'সমস্ত দোষ স্যার আশুতোষের নয়'[২৪] একথা মেনে নিতে রামানন্দের কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু এর দায়িত্ব যে আশুতোষের ওপরই বর্তায়, উপরোক্ত রচনাগুলিতে সে কথা তিনি বলেছেন। তাই আশুবাবু 'দেউলিয়া' বাংলা সরকারের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একাসনে বসিয়ে 'আহ্লাদিত' হওয়ায় রামানন্দের কটাক্ষ আরও একবার হজম করতে হয়েছিল তাঁকে।[২৫]

আর এই প্রসঙ্গেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আর্থিক স্বাধীনতা'র প্রশ্নে তাঁর কোনও দ্বিমত ছিল না।[২৬] কিন্তু ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের সচিব মি. শার্পের মতই রামানন্দ মনে করতেন আশুতোষের নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগটি আসলে 'সাম্রাজ্যের ভেতর আরেকটি সাম্রাজ্য'।[২৭] শার্পের 'উকিলগিরি' তিনি করেননি, কিন্তু আশুতোষের 'যাত্রার দলের ভীমোচিত বীরত্ব ও আস্ফালন পূর্ণ' বক্তৃতা : 'আমি আমার স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের বলব প্রয়োজনে নিজেরা উপবাসী থাকুন, পরিবারকে উপবাসী রাখুন কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দেবেন না', রামানন্দের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। কারণ :

> আশুবাবুর জজিয়তী এখনও আছে, পূর্ব্বসঞ্চিত পুঁজিও যে নাই, এমন নয়। সুতরাং তাঁহার নিজের যখন উপবাস-সম্ভাবনা বা উপবাস-প্রবৃত্তি নাই, তখন অপরকে উপবাসী থাকিতে বলা ন্যায়াধীশের পক্ষে অন্যায় ও অশোভন কথা হইয়াছে। বেতনের বদলে 'স্বাধীনতাজান' বাষ্প (Freedomogen Gas) কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে কি?[২৮]

প্রবাসী-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'স্বাধীনতাজান' বাষ্প প্রয়োগের কার্টুন-চিত্র (পৌষ,১৩২৯, পৃ. ৪৪৪)। এক্ষেত্রে কোনও কোনও সময় মনে হয় রামানন্দ বোধকরি আশুতোষের ওপর খানিক অবিচারই করে ফেলেছেন। স্বাধীনচেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি দপ্তরে

পরিণত করার সম্ভাবনার ব্যাপারে চিরদিনই খড়্গহস্ত ছিলেন। আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ারও চরম অপক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাই জীবনের অন্তিমপর্বে শর্তসাপেক্ষে উপাচার্য পদে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এনিয়েও রামানন্দের বক্রোক্তির মুখে পড়তে হয় তাঁকে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ছোটলাট তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লর্ড লিটনের সঙ্গে তপ্ত পত্র-বিনিময় হয় উপাচার্য আশুতোষের। *প্রবাসী* ('বিবিধ প্রসঙ্গ', বৈশাখ, ১৩৩০)-তে বিষয়টির অবতারণা করে এক্ষেত্রেও আশুতোষের বিরুদ্ধে নিজের বিরূপতা বজায় রাখেন রামানন্দ। যদিও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন 'গবর্ণ্‌মেন্ট আশু-বাবুকে এই পদ (উপাচার্য) দিয়া ততটা বাধিত করেন নাই, আশুবাবু এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিশ্রম করিয়া গবর্ণ্‌মেন্ট্‌কে যতটা বাধিত করিয়াছেন।'[২৯] লিটন সাহেবকে সুতীব্র ভাষায় আক্রমণ করে আশুতোষ তাঁকে লিখেছিলেন যে তিনি আসলে 'আজ্ঞানুবর্তী', 'সেনেটের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি' করতে সক্ষম উপাচার্য নিয়োগ করতে চাইছেন। আশুবাবুর এই বক্তব্যকে 'আত্যন্তিক অহঙ্কার' এবং 'অন্যদের সম্বন্ধে সাতিশয় হীনধারণা' সম্পন্ন বলে মনে হয়েছিল রামানন্দের।[৩০] মায় আশুতোষ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন স্বীকার' করে নিয়েছেন প্রকারান্তরে, এমন মন্তব্যও করেছিলেন তিনি।[৩১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয় নিয়ে রামানন্দের সঙ্গে আশুতোষের অশান্তি লেগেই থাকতো। যেমন আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঙালির আপনার বস্তু মনে করে তদ্রূপ আচরণ করা উচিৎ বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিভাগে কতজন অবাঙালি অধ্যাপক আছে সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর এহেন বক্তব্যের সারবত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন রামানন্দ।[৩২] আবার বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্রের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামনে রাখা 'দুঃখজনক' মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য সেনেট মনোনীত কমিটির সদস্য হিসেবে আশুতোষের নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। কারণ প্রভাসবাবু বর্ণিত ত্রুটি অনেকাংশে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ঘটেছে বলে অভিমত ছিল রামনন্দের।[৩৩] রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু কিংবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত মানুষদের প্রতি আশুতোষের 'বিদ্বেষমূলক আচরণে'র বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন রামানন্দ, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় (*কোরক*-সাহিত্য পত্রিকার ২০১৫ বইমেলা সংখ্যায় 'অথ রামানন্দ-আশুতোষ সংবাদ' প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোকপাত করেছেন নির্মাল্য-কুমার ঘোষ)। রামানন্দ-কন্যা শান্তা দেবী তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলনে প্রতিপক্ষ রামানন্দকে আশুতোষ-গোষ্ঠী রীতিমতো সমীহ করতেন। কারণ প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করতেন না রামানন্দ। শান্তাদেবীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা সকলেই করেন ও ছাপেন। কিন্তু সে যুগে, রামানন্দ ছাড়া কারও একাজে অগ্রসর হবার সাহস ছিল না।'[৩৪]

তবে এই বাগ্‌যুদ্ধের পালা সাঙ্গ হলো আশুতোষের প্রয়াণে। *প্রবাসী* (আষাঢ়, ১৩৩১) এবং *দ্য মডার্ন রিভিউয়ে* (জুন, ১৯২৪) সুদীর্ঘ, সচিত্র প্রয়াণ-লেখয় আশুতোষের ভূয়যী প্রশংসা করলেন রামানন্দ। তাঁর স্বীকারোক্তি :

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি (আশুতোষ) প্রধান স্থপতি। তিনি ইহাকে যতটা গড়িয়াছেন, আর কেহ ততটা নহে। ইহার ভালর জন্য প্রশংসা ও মন্দের জন্য দায়িত্ব তাঁহার যত বেশী, অন্য কাহারও তত নহে।[৩৪]

একটি কৌতুকোদ্দীপক তথ্য দিয়ে বিষয়টি সমাপ্ত করবো। এঁদের বৈরিতায় হাস্যরসের উপাদানও বিলকুল ছিল। যেমন *প্রবাসী*-র ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ. ১৯৫) এবং *দ্য মডার্ন রিভিউ*য়ের মে, ১৯২১ সংখ্যায় (পৃ. ৬৭৫) গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা আশুতোষের কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রিয় ভীমনাগের সন্দেশ, চিনিপাতা দই আর হিমসাগর আমের সামনে আশুতোষ। ওদিকে বাংলায় স্লোগান 'সামাল, সামাল' আর ইংরেজিতে ক্যাপশন 'Versity Scream'। কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি?

উল্লেখপঞ্জি :

১। *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৩১ ব.। পৃ. ৪২৫-৪২৬।
২। *প্রদীপ*, চৈত্র, ১৩০৪ ব.। পৃ. ১৪২-১৪৩।
৩। *দ্য মডার্ন রিভিউ*, এপ্রিল, ১৯২১ খ্রি.। পৃ. ৫৩৮।
৪। *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। পৃ. ১৭৮।
৫। *দ্য মডার্ন রিভিউ*, এপ্রিল, ১৯২১ খ্রি. পৃ. ৫৫৪।
৬। *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। পৃ. ১৭৭।
৭। *দ্য মডার্ন রিভিউ*, মে, ১৯২১ খ্রি.। পৃ. ৬৬৪-৬৬৫।
৮। *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। পৃ. ১৭৮।
৯। *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩২৭। পৃ. ৩৬১।
১০। *দ্য মডার্ন রিভিউ*, মে, ১৯২১। পৃ. ৬৯০।
১১। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩২৭। পৃ. ৫৫৯।
১২। *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩২৭। পৃ. ৪৯৪।
১৩। তদেব। পৃ. ৪৯৪।
১৪। তদেব। পৃ. ৪৯৫।
১৫। *প্রবাসী*, আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৫৯০।
১৬। তদেব, পৃ. ৫৯৫।
১৭। *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩২৭। পৃ. ৪৯৬।
১৮। *প্রবাসী*, আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৫৯৩।
১৯। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩২৮। পৃ. ৮৯৩।
২০। *দ্য মডার্ন রিভিউ*, সেপ্টেম্বর, ১৯২১। পৃ. ৩৭০-৩৭১।
২১। *মানসী ও মর্মবাণী*, ফাল্গুন, ১৩২৭। পৃ. ৬৯।
২২। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩২৭। পৃ. ৫৫৭।

২৩। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩২৮। পৃ. ৮৯৩।

২৪। *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩২৮। পৃ. ১৪২।

২৫। তদেব। পৃ. ১৩৬।

২৬। *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

২৭। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮। পৃ. ৩০৭। অপিচ দ্রষ্টব্য : 'মি. শার্প অ্যান্ড দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' ('নোটস', *দ্য মডার্ন রিভিউ*, মে, ১৯২১)।

২৮। *প্রবাসী*, পৌষ, ১৩২৯। পৃ. ৪৪৫।

২৯। *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৩০। পৃ. ১২৩।

৩০। *প্রবাসী*, তদেব। পৃ. ১২৬।

৩১। তদেব, পৃ. ১২৭।

৩২। *প্রবাসী*, পৌষ, ১৩২৭। পৃ. ২৮৩।

৩৩। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩২৮। পৃ. ৯০০। অপিচ দ্রষ্টব্য : *দ্য মডার্ন রিভিউ*, এপ্রিল, ১৯২২। পৃ. ৫২৫।

৩৪। *প্রবাসী ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ*, ৩১ চৈত্র, ১৩৬৭ ব.। পৃ. ৯।

৩৫। *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৩১। পৃ. ৪২৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। *আশুতোষের ছাত্রজীবন* : অতুলচন্দ্র ঘটক, ১৯২৪। আনন্দ সং. ১৯৮৬। সম্পা : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

২। *আশুতোষ-স্মৃতিকথা* : দীনেশচন্দ্র সেন। প্রথম সং. ১৯৩৬। পারুল সং. ২০১১।

৩। *আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা* : ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

৪। *ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা* : শান্তা দেবী, প্রথম সং. ১৯৪৫ খ্রি.। দে'জ সং. ২০০৫ খ্রি.।

৫। *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়* : যোগেশচন্দ্র বাগল। সাহিত্যসাধক চরিতমালা-১০১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। প্রথম সং. ১৩৭১ ব.।

৬। *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী—ইতিহাসের ধারা* (দ্বিতীয় খণ্ড) : সম্পা. শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসু। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯।